শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজতক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি--

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?

কাদের?

ঐ-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তাঁর মেসে গিয়া বলিলেন, চল্‌।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো--

'আজ্ঞা হাঁ' বৈকি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-একজন ছিলাম শুশ্রূষাবতী ; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম--কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো

তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না ; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই ; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন : সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয় ; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই--সে যে আবর্জনা।

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল ? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই ?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্-এক জায়গায় শচীশ--আমাদের শচীশ--লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দস্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া ? শত্রুর দল যে হাসিবে ! শত্রু তো এক-আধ জন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

৪

গেলাম লীলানন্দস্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী ! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ !

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে ?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনই লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন--থাক্, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘন্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম ; সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে

স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না--কিন্তু কী জানি--সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামী জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই-- মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যা-সমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে ? জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু ?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উলটাইয়া দিয়া শচীশ কিছু-বা স্নেহের কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায় ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন ? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না--মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন ; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি--

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন-একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত' ; সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো ; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই ; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না--আমি যে আমি।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না ; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল ; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব !

৫

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দস্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন ; সমস্ত দলবল-সমতে তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায় ; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল ; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে অকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই--কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম--চট্‌ক ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্‌টিয়ারি করিয়াছি, পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছি ; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব ; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি ; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালো-মন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার

সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমারাই তাঁর প্রদান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলায় উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চস্বরের ডাক--'বামী'। আমরা ভাবের যে-আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটা পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম, রসের লোক তো ঐখানেই--যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবি গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি-- সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি-- অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে,সে পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনাফার হঠাৎ-প্লাবনে উপচিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভলো ছিল,এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের

স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গনৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্‌-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্‌-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দস্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এইজন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অর্ন্তযামী ; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে--তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিয়াছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল

আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে ! ঢের ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে--ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েকদিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না--লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্‌শা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়--তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্‌ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্‌ করিতে থাকিত। এক-এক বার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না--ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব ; সেই যে চামারদের ছেলেগুলাকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাটের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর,

ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন ? সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল, সম্বৎসর ইহার জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড ! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া !

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘন্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ ! একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ ; নারকেলবনের পল্লীজীবনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন-- আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে--

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমিষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন--

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও--তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল--অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো--তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী ; তার মন নাই--সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে--সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্‌ঝপ্‌ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্‌ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম--সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি ; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানি না কতক্ষণ পরে--সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়--অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা !

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রতমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে--এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে

হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই--তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ !

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে--ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে--সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোয়া নাই, কিন্তু হটাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না ?